উপেক্ষিতা

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

পথে যেতে যেতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে বোধ হয় বাংলা দুই কি তিন সালের কথা। নতুন কলেজ থেকে বার হয়েছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, স্কুল-মাস্টারী নিয়ে গেলুম হুগলী জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে।....গ্রামটির অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল থাকলেও আমি যখন গেলুম তখন তার অবস্থা খুব শোচনীয়। খুব বড় গ্রাম, অনেকগুলি পাড়া, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বোধ হয় এক ক্রোশেরও ওপর। প্রাচীন আম-কাঁঠালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার ।

আমি ও গ্রামে থাকতুম না। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সে গ্রামের রেলস্টেশন। স্টেশনমাস্টারের একটি ছেলে পড়ানোর ভার নিয়ে সেই রেলের P.W.D-এর একটা পরিত্যক্ত বাংলোয় থাকতুম। চারিদিকে নির্জন মাঠ, মাঝে মাঝে তাল-বাগান। স্কুলটি ছিল গ্রামের ও-প্রান্তে। মাঠের মধ্যে নেমে হেঁটে যেতুম প্রায় এক ক্রোশ।

একদিন বর্ষাকাল, বেলা দশটা প্রায় বাজে, স্কুলে যাচ্ছি। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটু শীঘ্র যাবার জন্য পাড়ার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে সেইটে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত পথটা বড় বড় আম-কাঁঠালের ছায়ায় ভরা। একটু আগে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। গাছের ডাল থেকে টুপ্‌টুপ্ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছিল। একটা জীর্ণ ভাঙ্গা ঘাটওয়ালা প্রাচীন পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কে একটি স্ত্রীলোক, খুব টক্‌টকে রংটা, হাতে বালা অনন্ত, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঘড়া নিয়ে উঠলেন আমার সামনের রাস্তায়। বোধ হয় পুকুরে যাচ্ছিলেন জল আনবার জন্যে। আমায় দেখে ঘোমটা টেনে পথের পাশে দাঁড়ালেন। আমি পাশ কাটিয়ে জোরে চলে গেলুম। আমার এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু তখন আমি ইউনিভার্সিটির সদ্যপ্রসূত গ্র্যাজুয়েট, বয়স সবে কুড়ি, অবিবাহিত। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পাতায় পাতায় যে সব তরলিকা, মঞ্জুলিকা, বাসন্তী-উজ্জয়িনীবাসিনী অগুরু-বাস-মোদিত-কেশা তরুণী অভিসারিকার দল, তারা—আর তাদের সঙ্গে ইংরেজী কাব্যের কত Althea, কত Genevieve, Theosebia তাদের নীল নয়ন আর তুষার-ধবল কোমল বাহুবল্লী নিয়ে আমার তরুণ মনের মধ্যে রাতদিন একটা সুমিষ্ট কল্পলোকের সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাই সেদিন সেই সুশ্রী তরুণী, তাঁর বালা-অনন্ত-পরা অনাবৃত হাতদুটির সুঠাম সৌন্দর্য আর সকলের ওপর তাঁর পরনের শাড়ী দ্বারা নির্দিষ্ট তাঁর সমস্ত দেহের একটা মহিমান্বিত সীমারেখা আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত করে ফেললে। আমার মনের ভিতর এক প্রকারের নূতন অনুভূতি, আমার বুকের রক্তের তালে তালে সেদিন একটা নূতন স্পন্দন আমার কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল।....

বিকালবেলা রেল-লাইনের ধারে মাঠে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তালবাগানের মাথার ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রং-এর মেঘগুলো দেখতে দেখতে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো হয়ে উঠতে লাগল।....আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখতে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর।....বশে কল্পনা করে নেওয়া যাচ্ছিল, সেই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গূঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিন কেটে গিয়ে রাত হল। বাসায় এসে Keats পড়তে শুরু করলুম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে। অনেক রাত্রে উঠে দেখলুম বাইরে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে....আকাশ মেঘে অন্ধকার ।....

তার পরদিনও পাড়ার ভেতর দিয়ে নেমে গেলুম। সেদিন কিন্তু তাঁকে দেখলুম না। আসবার সময়ও সেখান দিয়েই এলুম, কাউকে দেখলুম না। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার দিন আবার সেই পথ দিয়েই গেলুম। পুকুরটার কাছাকাছি গিয়েই দেখি যে তিনি জল নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।....আমার বুকের রক্তটা যেন দুলে উঠল, খুব জোরে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম।....রাস্তার বাঁকের কাছে গিয়ে ইচ্ছা আর দমন করতে না পেরে একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখি, তিনি ঘাটের ওপর উঠে ঘোমটা খুলে কৌতূহলী নেত্রে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইতেই ঘোমটা আবার টেনে দিলেন।

ওপরের পথটা ছেড়েই দিলুম একেবারে। পুকুরের পথ দিয়েই রোজ যাই। দু'একদিন পরে আবার একদিন তাঁকে দেখতে পেলুম। আমার মনে হ'ল সেদিনও তিনি আমায় একটু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। এইভাবে পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেল। কোনদিন তাঁকে দেখতে পাই, কোনদিন পাই না। আমার কিন্তু বেশ মনে হতে লাগল, তিনি আমার প্রতি দিন দিন আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠছেন। আজকাল ততটা ত্রস্তভাবে ঘোমটা দেন না। আমারও কি হ'ল—তাঁর গতি-ভঙ্গীর একটা মধুর শ্রী, তাঁর দেহের একটা শান্ত কমনীয়তা, আমায় দিন দিন যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল ।....

একদিন তখন আশ্বিন মাসের প্রথম, শরৎ পড়ে গিয়েছে....নীল আকাশের সাদা সাদা লঘু মেঘখণ্ড উড়ে যাচ্ছে.....চারিদিকে খুব রৌদ্র ফুটে উঠেছে....রাস্তার পাশের বনকচু, ভাঁট শেওড়া, কুঁচলতার ঝোপ থেকে একটা কটুতিক্ত গন্ধ উঠছে।....শনিবার সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরছি। রাস্তা নির্জন, কেউ কোন দিকে নেই। পুকুরটার পথ ধরেছি, একদল ছাতারে পাখী পুকুরের ওপারের ঝোপের মাথায় কিচ্ কিচ্ করছিল, পুকুরের জলের নীল ফুলের দলগুলো রৌদ্রতাপে মুড়ে ছিল। আমি আশা করিনি এমন সময় তিনি পুকুরের ঘাটে আসবেন। কিন্তু দেখলুম তিনি জল ভরে উঠে আসছেন। এর আগে চার-পাঁচ দিন তাঁকে দেখিনি, হঠাৎ মনে কি হ'ল, একটা বড় দুঃসাহসের কাজ করে বসলুম। তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—দেখুন, কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি এখানকার স্কুলে কাজ করি, রোজ এই পথে যেতে যেতে আপনাকে দেখতে পাই, আমার বড় ইচ্ছে করে আপনি আমার বোন হন। আমি আপনাকে বৌদিদি বলব, আমি আপনার ছোট ভাই। কেমন তো ? তিনি আমার কথার প্রথম অংশটায় হঠাৎ চমকে উঠে কেমন জড়োসড়ো হয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয় অংশটায় তাঁর সে চমকানো ভাবটা একটু দূর হল। ঘড়া-কাঁখে নীচু চোখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যুক্তকরে প্রণাম করে বললুম—বৌদিদি, আমার এ ইচ্ছা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। আমাকে ছোট ভাইয়ের অধিকার দিতেই হবে আপনাকে।

তিনি ঘোমটা অর্ধেকটা খুলে একটা স্থির শান্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সুশ্রী মুখ যে আমি কখনো দেখিনি তা নয়, তবুও মনে হ'ল তাঁর ডাগর কালো চোখদুটির শান্ত ভাব আর তাঁর ঠোঁটের নীচের একটা বিশেষ ভাঁজ, এই দুটিতে মিলে তাঁর সুন্দর মুখের গড়নে এমন এক বৈচিত্র্য এনেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলুম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাড়ী কোথায় ?

আনন্দে সারা গা কেমন শিউরে উঠল। বললুম-কলকাতার কাছে, চব্বিশ পরগণা জেলায়। এখানে স্টেশনে থাকি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

নাম বললুম।

তিনি বললেন—তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

বললুম—এখন বাড়ীতে শুধু মা আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাবা এই দু'বৎসর মারা গিয়েছেন।

তিনি একটু যেন আগ্রহের সুরে বললেন—তোমার কোন বোন নেই ?

আমি বললুম—না। আমার দু'জন বড় বোন ছিলেন, তাঁরা অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বড়দি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট, মেজদি পাঁচ-ছ'বৎসর মারা গিয়েছেন। আমি এই মেজদিকেই জানতুম, তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি আমার চেয়েও ছয় বছরের বড় ছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি একটু ব্যথা-কাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মেজদি থাকলে এখন তাঁর বয়স হ'ত কত ?

বললুম—এই ছাব্বিশ বছর।

তিনি একটু মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন-তাই বুঝি ভাইটির আবার একজন বোন খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, না ?

কি মিষ্টি হাসি ! কি মধুর শান্ত ভাব ! মাথা নীচু করে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম—তা হলে ভাইয়ের অধিকার দিলেন তো আপনি ?

তিনি শান্ত হাসিমাখা মুখে চুপ করে রইলেন।

আমি বললুম—বৌদি, আমি জানতুম আমি পাব। আগ্রহের সঙ্গে খুঁজলে ভগবানও নাকি ধরা দেন, আমি একজন বোন অনায়াসেই পাব। আচ্ছা এখন আসি। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না বৌদি, আপনার যেন দেখা পাই। রবিবার বাদে আমি দু'বেলাই এ রাস্তা দিয়ে যাব।

আমার মাঠের ধারের তাল-বাগানটার পাখীগুলো রোজই সকাল বিকাল ডাকে। একটা কি পাখী তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আনে। মন যেদিন ভারী থাকে সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য প্রাণের মধ্যে কোন সাড়া দেয় না।....আজ দেখলুম পাখীটার গানের সুরের স্তরে স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠছে।....মনে হতে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্নের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্তত বর্ধিত অযত্ন-সম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে।

তার পরদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ল ছুটির পর বিকালবেলা। বৌদিদি যেন চাপা হাসির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন— এই যে, বিমলের বুঝি আজ খুব সকাল সকাল স্কুলে যাওয়া হয়েছিল ।

আমি উত্তর দিলুম—বেশ বৌদি, আমি ওবেলা তো ঠিক সময়েই গেলুম—আপনিই ছিলেন না, এখন দোষটা বুঝি আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, না ? আর বৌদি, ঘাটে ওবেলা আরও সব মেয়েরা ছিলেন ।

বৌদিদি হেসে ফেললেন, বললেন—তাই তো! ভাইটির আমার ওবেলা তো বড় বিপদ গিয়েছে তা হলে!

আমার একটু লজ্জা হ'ল, ভাল করে জবাব দিতে না পেরে বললুম—তা নয় বৌদি, আমি এখানে অপরিচিত, পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ—পাছে কেউ কিছু মনে করে !

বৌদিদির চোখের কৌতুক দৃষ্টি তখনও যায়নি, তিনি বললেন—আমি ওবেলা ঘাটের জলেই ছিলাম বিমল। তুমি ওই চট্‌কা গাছটার তলায় গিয়ে একবার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে, আমায় তুমি দেখতে পাওনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আপনার বাপের বাড়ী কোথায় ?

বৌদিদি উত্তর দিলেন, খোলাপোতা চেনো ? সেই খোলাপোতায়।

আমি ইতস্তত করছি দেখে আমায় আর একটু বিশদ সংবাদ দিয়ে বললেন, ওই যে খোলাপোতার রাস ! বৌদিদির হাসিভরা দৃষ্টি যেন একটু গর্বমিশ্রিত হয়ে উঠল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে, খোলাপোতা বলে কোনো গ্রামের নাম এই আমি প্রথম শুনলুম। অথচ বৌদির বাপের বাড়ী, যেখানে এমন রাস হয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত খোলাপাতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা পাছে তাঁর মনে ব্যথা দেয়, এই ভয়ে বলে ফেললুম—ও ! সেই খোলাপোতায় ? ওটা কোন্ জেলায় ভাল....

বৌদিদির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম কিন্তু দেখলুম তিনি সে বিষয়ে নির্বিকার। তাঁর হাসিভরা সরল মুখখানির দিকে চেয়ে আমার করুণা হ'ল, এ-সমস্ত জটিল ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে তাঁকে পীড়িত করতে আর আমার মন সরল না।

বললুম—আচ্ছা বৌদি, আসি তা হলে।

বৌদিদি তাড়াতাড়ি ঘড়ার মুখ থেকে কলার পাতে মোড়া কি বার করলেন। সেইটে আমার হাতে দিয়ে বললেন—কাল চাপ্‌ড়া ষষ্ঠীর জন্যে ক্ষীরের পুতুল তৈরী করেছিলাম, আর গোটাকতক কলার বড়া আছে, বাসায় গিয়ে খেও।

চার-পাঁচ দিন জ্বর ভোগের পর একদিন পথ্য পেয়ে স্কুলে যাচ্ছি, বৌদিদির সঙ্গে দেখা। আমায় আসতে দেখে বৌদিদি উৎসুক দৃষ্টিতে অনেকদূর থেকে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। নিকটে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি বিমল, এমন মুখ শুকনো কেন ?

বললুম—জ্বর হয়েছিল বৌদিদি।

বৌদিদি উদ্বেগের সুরে বললেন—ও, তাই তুমি চার-পাঁচদিন আসনি বটে । আমি ভাবলাম, বোধ হয় কিসের ছুটি আছে। আহা তাই তো, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ যে বিমল।

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের ব্যথা-মিশ্রিত স্নেহের আত্মপ্রকাশ বেশ বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা নিবিড় আনন্দ পেলুম। হেসে বললুম—যে দেশ আপনাদের বৌদি, একবার অতিথি হলে আপ্যায়নের চোটে একেবারে অস্থির করে তুলবে।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বিমল, ওখানে তোমায় রেঁধে দেয় কে ?

আমি বললুম—কে আর রাঁধবে, আমি নিজেই।

বৌদিদি একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা বিমল, এক কাজ করো না কেন ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি বৌদি ?

তিনি বললেন—মাকে এই পুজোর ছুটির পর নিয়ে এসো। এরকমভাবে কি করে বিদেশে কাটবে বিমল ? লক্ষ্মীটি, ছুটির পর মাকে অবিশ্যি করে নিয়ে এসো। এই গাঁয়ের ভূতের অনকে বাড়ী পাওয়া যাবে। আমাদেরে পাড়াতেই আছে। নাহ'লে অসুখ হলে কে একটু জল দেয়? আচ্ছা হ্যাঁ বিমল, আজ যে পথ্য করলে, কে রেঁধে দিলে?

আমার হাসি পেল, বললুম—কে আবার দেবে বৌদি ? নিজেই করলুম।

তিনি আমার দিকে যেন কেমন ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর সেদিনকার সেই সহানুভূতি-বিগলিত স্নেহ-মাখানো মাতৃমুখের জলভরা কালো চোখদুটি পরবর্তী জীবনে আমার অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।.....

সেদিন স্কুল থেকে আসবার সময় দেখি, বৌদিদি যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে কলার পাতায় মোড়া কি একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—শরীরটা একটু না সারলে, রাত্রে গিয়ে রান্না, সে পেরে উঠবে না বিমল। এই খাবার দিলাম, রাত্রে খেও....

বোধ হয় একটু আগেই তৈরী করে এনেছিলেন, আমি হাতে বেশ গরম পেলুম। বাসায় এসে কলার পাতা খুলে দেখি, খানকতক রুটি, মোহনভোগ, আর মাছের একটা ডালনা মত।

তার পরদিন ছুটির পর আসবার সময়ও দেখি বৌদিদি খাবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার হাতে দিয়ে বললেন—বিমল, তুমি তোমার ওখানে দুধ নাও ?

আমি বললুম—কেন, তা হ'লে দুধও খানিকটা করে দেন বুঝি ? সত্যি বলছি বৌদি, আপনি আমার জন্য অনর্থক এ কষ্ট করবেন না, তা হলে এ রাস্তায় আমি আর আসছি না।

বৌদিদির গলা ভারী হয়ে এল, আমার ডান হাতটা আস্তে আস্তে এসে ধ'রে ফেললেন, বললেন—লক্ষ্মী ভাই, ছিঃ ও-কথা বলো না। আচ্ছা, আমি যদি তোমার মেজদিই হতাম, তা হলে এ কথা কি আজ আমায় বলতে পারতে ? আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে।

সেই দিন থেকে বৌদিদি রোজ রাত্রের খাবার দেওয়া শুরু করলেন। সাত—আট দিন পরে রুটির বদলে কোনদিন লুচি, কোনদিন পরোটা দেখা দিতে লাগল। তাঁর সে আগ্রহভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর সেসব স্নেহের দান ঠিক অস্বীকারও করতে পারতুম না; অথচ এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করতুম যে আমার এই নিত্য খাবার যোগাতে না জানি বৌদিদিকে কত অসুবিধাই পোহাতে হচ্ছে। তার পরই আশ্বিন মাসের শেষে পুজোর ছুটি এসে পড়াতে আমি নিষ্কৃতি পেলুম।

সমস্ত পুজোর ছুটিটা কি নিবিড় আনন্দেই কাটল সেবার। আমার আকাশ বাতাস যেন রাতদিন আফিমের রঙিন ধূমে আচ্ছন্ন থাকত। ভোর বেলা উঠানের শিউলি গাছের সাদা ফুল বিছানো তলাটা দেখলে হেমন্ত রাত্রির শিশিরে ভেজা ঘাসগুলোর গা যেমন শিউরে আছে, ওই রকম আমার গা শিউরে উঠত....কার ওপর আমার জীবনের সমস্ত ভার অসীম নির্ভরতার সঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আমার মন যেন শরতের জলভার নামানো হাল্‌কা মেঘের মত একটা সীমাহারা হাওয়ার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল ।

ছুটি ফুরিয়ে গেল। প্রথম স্কুল খোলবার দিন পথে তাঁকে দেখলুম না। বিকালে যখন ফিরি, তখন শীতল হাওয়া একটু একটু দিচ্ছে।...পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু, কাল-কাসুন্দা, ধুতুরা, কুচকাঁটা, ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি করে একটুখানি ছোট ছোট ঝোপ মত তৈরী করেছে....শীতল হেমন্ত অপরাহ্ণের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে....এমন একটা মিষ্ট নির্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠেছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চল-প্রান্তের মত।

তার পরদিন তাঁকে দেখলুম।

তিনি আমায় লক্ষ্য করেননি, আপন মনে ঘাটের চাতালে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলুম—বৌদি!....বৌদিদি কেমন হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে ফিরলেন।

—এ কি বিমল ! কবে এলে ? আজ কি স্কুল খুলল ? কি রকম আছ ?....সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বরটি ! সেই স্নেহ-ঝরা শান্ত চোখ দুটি ! বৌদিদি আমার মনে ছুটির আগে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, ছুটির পরের স্থানটা তার চেয়ে আরও ওপরে।....আমি সমস্ত ছুটিটা তাঁকে ভেবেছি, নানা মূর্তিতে নানা অবস্থায় তাঁকে কল্পনা করেছি, নানা গুণ তাতে আরোপ করেছি, তাঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধ মনের মধ্যে অনেক ভাঙা-গড়া করেছি। আমার মনের মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা ভালবাসায় গড়া তাঁর কল্পনা-মূর্তিকে অনেক অর্ঘ্যচন্দনে চর্চিত করেছি। তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখলুম, তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্মলা, পূতহৃদয়া পুণ্যময়ী মানসী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদিদিকে তিনি তাঁর মহিমাখচিত দিব্য বসনের আচ্ছাদনে আবৃত করে রেখেছিলেন, তাঁর স্নেহ-করুণার জ্যোতিবাষ্পে বৌদিদির রক্তমাংসের দেহটার একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

আমার মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ল, আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। বৌদিদি বললেন—এসো, এসো ভাই, আর প্রণাম করতে হবে না, আশীর্বাদ করচি এমনিই—রাজা হও। আচ্ছা বিমল, বাড়ী গিয়ে আমার কথা মনে ছিল ?

মনে এলেও বাইরে আর বলতে পারলুম না—কে তবে আমার মগ্ন চৈতন্যকে আশ্রয় করে আমার নিত্যসুষুপ্তির মধ্যেও আমার সঙ্গিনী ছিল বৌদি ?....শুধু একটু হেসে চুপ করে রইলুম। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—মা ভাল আছেন?

আমি উত্তর দিলুম—হ্যাঁ বৌদি, তিনি ভাল আছেন। তাঁকে আপনার কথা বললুম।

বৌদিদি আগ্রহের সুরে বললেন—তিনি কি বললেন ?

আমি বললুম—শুনে মার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললেন—একবার দেখাবি তাকে বিমল ? আমার নলিনীর শোক বোধ হয় তাকে দেখলে অনেকটা নিবারণ হয়।

বৌদিদিরও দেখলুম দুই চোখ ছলছল করে এল, আমায় বললেন, হ্যাঁ বিমল, তা মাকে এই মাসে নিয়ে এলে না কেন?

আমি বললুম—সে এখন হয় না বৌদি।

বৌদিদি একটু ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—বিমল, জানো তো সেবার কি রকম কষ্টটা পেয়েছ ! এই বিদেশবিভুঁই, মাকে আনলে এই মিথ্যে কষ্টটা তো আর ভোগ করতে হয় না ।

আমি উত্তর দিলুম—বৌদি, আমি তো আর ভাবিনে যে আমি বিদেশে আছি, যেখানে আমার বৌদি রয়েছেন, সে দেশ আমার বিদেশ নয়। মা না থাকলেও আমার এখানে ভাবনা কিসের বৌদি ?

বৌদিদির চোখে লজ্জা ঘনিয়ে এলো, আমার দিকে ভাল করে চাইতে পারলেন না, বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সবই করছি। আমার কি কিছু করবার জো আছে ? কত পরাধীন আমরা তা জানো তো ভাই ! ওসব নয়, তুমি এই মাসেই মাকে আনো।

আমি কথাটাকে কোন রকমে চাপা দিয়ে সেদিন চলে এলুম।

তার পরদিন ছুটির পর বৌদিদির সঙ্গে দেখা। অন্যান্য কথাবার্তার পর আসবার সময় তিনি কলার পাতে মোড়া আবার কি একটা বার করলেন। তাঁর হাতে কলার পাত দেখলেই আমার ভয় হয় ; আমি শঙ্কিতচিত্তে বলে উঠলুম—ও আবার কি বৌদি ? আবার সেই.....

বৌদিদি বাধা দিয়ে বললেন—আমার কি কোন সাধ নেই বিমল ? ভাইফোঁটাটা অমনি অমনি গেল, কিছু কি করতে পারলুম ? কলার পাতা মোড়া রহস্যটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—এতে একটু মিষ্টিমুখ করো, আর এইটে নাও—একখানা কাপড় কিনে নিও।

কথাটা ভাল করে শেষ না করেই বৌদি আমার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিতে এলেন। আমি চমকে উঠলুম, বললুম—এ কি বৌদি, না না, এ কিছুতেই হবে না ; খাবার আমি নিচ্ছি, কিন্তু টাকা নিতে পারব না।

আমার কথাটার স্বর বোধ হয় একটু তীব্র হয়ে পড়েছিল, বৌদিদি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তার প্রসারিত হাতখানা ভাল করে যেন গুটিয়ে নিতেও সময় পেলেন না, যেন কেমন হয়ে গেলেন। তারপর একটুখানি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরই তাঁর টানা কালো চোখদুটি ছাপিয়ে বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়ল ; আমার বুকে যেন কিসের খোঁচা বিঁধল।

এই নিতান্ত সরলা মেয়েটির আগ্রহ-ভরা স্নেহ-উপহার রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বুকে যে লজ্জা আর ব্যথার শূল বিদ্ধ করলুম, সে ব্যথার প্রতিঘাত অদৃশ্যভাবে আমার নিজের বুকে গিয়েও বাজল !

আমি তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর হাত থেকে নোটখানা ও খাবার দুই নিয়ে বললুম—বৌদি, ভাই বলে এ অপরাধ এবারটা মাপ করুন আমার। আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না।

বৌদিদির চোখের জল তখনও থামেনি।

দুই চোখ জলে ভরা সে তরুণী দেবী মূর্তির দিকে ভাল করে চাইতে না পেরে আমি মাথা নীচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাড়ী এসে দেখলুম, কলার পাতের মধ্যে কতকগুলো দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, সুন্দর করে তৈরী। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে বৌদিদির বিষণ্ণ-কাতর দৃষ্টি বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

মাসখানেক কেটে গেল।

প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে দেখা হত। এখন আমরা ভাই-বোনের মত হয়ে উঠেছিলুম, সেই রকমই পরস্পরকে ভাবতুম। একদিন আসছি, ফ্লানেল শার্টের একটা বোতাম আমার ছিল না। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি, বোতাম কোথায় গেল?

আমি বললুম—সে কোথায় গিয়েছে বৌদি, বোতাম পরাতে জানিনে কাজেই ঐ অবস্থা।

তার পরদিন দেখলুম, তিনি ছুঁচ-সুতো-বোতাম সমেতই এসেছেন। আমি বললুম—বৌদি, এটা ঘাটের পথ, আপনি বোতাম পরাতে পরাতে কেউ যদি দেখে তো কি মনে করবে ! আপনি বরং ছুঁচটা আমায় দিন, আমি বাড়ী গিয়ে চেষ্টা করব এখন।

বৌদিদি হেসে বললেন—তুমি চেষ্টা করে যা করবে তা আমি জানি, নাও সরে এসো এদিকে।

বাধ্য হয়ে সরেই গেলুম। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বোতাম পরাতে লাগলেন । ভয়টা দেখলুম তাঁর চেয়ে আমারই হ'ল বেশী। ভাবলুম, বৌদির তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু যদি কেউ দেখে তো এর সমস্ত কষ্টটা ওঁকেই ভুগতে হবে।

একদিন বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—বিমল, গোকুল-পিঠে খেয়েছ ?

আমার মা খুব ভাল গোকুল-পিঠে তৈরী করতেন, কাজেই ও জিনিসটা আমি খুব খেয়েছি। কিন্তু বৌদিদিকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বললুম—সে কি রকম বৌদি?

আর রক্ষা নেই। তার পরদিনই বিকাল বেলা বৌদিদি কলার পাতে মোড়া পিঠে নিয়ে হাজির।

আমায় বললেন—তুমি এখানে আমার সামনেই খাও। ঘড়ার জলে হাত ধুয়ে ফেলো এখন।

আমি বললুম—সর্বনাশ বৌদি, এই এতগুলো পিঠে খেতে খেতে এ পথে লোক এসে পড়বে, সে হয় না, আমি বাড়ী গিয়েই খাব।

বৌদি ছাড়বার পাত্রীই নন, বললেন—না, কেউ আসবে না বিমল। তুমি এখানেই খাও।

খেলুম, পিঠে খুব ভাল হয়নি। আমার মায়ের নিপুণ হাতের তৈরী পিঠের মত নয় । বোধ হয় নতুন করতে শিখেছেন, ধারগুলো পুড়ে গিয়েচে, আস্বাদও ভাল নয়। বললুম—বাঃ বৌদি, বড় সুন্দর তো ! এ কোথায় তৈরী করতে শিখলেন ? আপনার বাপের বাড়ীর দেশে বুঝি ?

বৌদির মুখে আর হাসি ধরে না। হাসিমুখে বললেন—এ আমি, আমাদের গুরুমা এসেছিলেন, তিনি শহরের মেয়ে, অনেক ভাল খাবার করতে জানেন, তাঁর কাছে শিখে নিয়েছিলাম ।

তারপর সারা শীতকাল অন্যান্য পিঠের সঙ্গে গোকুল-পিঠের পুনরাবৃত্তি চলল। ঐ যে বলেছি, আমার ভাল লেগেছে, আর রক্ষা নেই।

একটা কথা আছে।

কিছুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ একটু একটু করে জমছিল, জীবনটাকে খুব বড় করে অনুভব করবার জন্যে। আমার এ কুড়ি-একুশ বছর বয়সে এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ থাকা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। চলেও যেতাম এতদিন। এখানকার একমাত্র বন্ধন হয়েছিলেন বৌদিদি। তাঁরই আগ্রহে স্নেহ-যত্নে সে অশান্ত ইচ্ছাটা কিছুদিন চাপা ছিল। এমন সময় মাঘ মাসের শেষের দিকে আমার এক আত্মীয় আমায় লিখলেন যে, তাঁদের কারখানা থেকে কাচের কাজ শেখবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় ছেলে পাঠানো হবে, অতএব আমি যদি জীবনে কিছু করতে চাই, তবে শীঘ্র যেন মোরাদাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেখানকার কাচের কারখানার ম্যানেজার।

পত্র পেয়ে সমস্ত রাত আমার ঘুম হ'ল না। ইউরোপ-আমেরিকা ! সে কত ঊর্মি-সঙ্গীত-মুখরিত শ্যাম সমুদ্রতট....কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি, দূরে সবুজ বিন্দুর মত ছোট ছোট দ্বীপ, ঐ কর্সিকা, ঐ সিসিলি ! নতুন আকাশ, নতুন অনুভূতি....ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়-প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাদচারণ, লাড্‌গেট সার্কাস, টটেন্‌হাম্ কোর্ট রোড-বার্চ-উইলো পপ্‌লার-মেপ্‌ল গাছের সে কত শ্যামল পত্রসম্ভার, আমার কল্পলোকের সঙ্গিনী কনক-কেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী, কত ইউজিনী।...

পরদিন সকালে পত্র লিখলুম—আমি খুব শীঘ্রই রওনা হব। স্কুলে সেদিনই নোটিশ দিলুম, পনেরো দিন পরে কাজ ছেড়ে দেব।

মন বড় ভাল ছিল না, উপরের পথটা দিয়ে কয়েকদিন গেলুম। দশ বারো দিন পরে নীচের পথটা দিয়ে যেতে যেতে একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা। বৌদিদি একটু অভিমান প্রকাশ করলেন—বিমল, বড় গুণের ভাই তো ! আজ চার পাঁচ দিনের মধ্যে বোনটা বাঁচল কি ম'ল তা খোঁজ করলে না?

আমি বললাম—বৌদিদি, করলে সেটাই অস্বাভাবিক হত ! বোনেরাই ভাইদের জন্যে কেঁদে মরে, ভাইয়েদের দায় পড়েছে বোনেদের ভাবনা ভাবতে। দুনিয়াসুদ্ধ ভাই-বোনেরই এই অবস্থা।

বৌদিদি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন। এই তরুণীর হাসিটি বালিকার মত এমন মিষ্ট নির্মল যে এ শুধু লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার মত উপভোগ করবার জিনিস, বর্ণনা করবার নয়। বললেন—তা জানি জানি, নাও, আর গুমোর করতে হবে না, সে গুণ যে তোমাদের আছে তা কি আমরা ভেতরে ভেতরে বুঝি না ? কিন্তু বুঝে কি করব, উপায় নেই। হ্যাঁ, তা সত্যি সত্যি মাকে কবে আনছ ?

আমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বৌদিদিকে কিছু বলিনি। সে কথা বললে যে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। একবার ভাবলুম, সেই তো জানাতেই হবে, একদিন বলে ফেলি। কিন্তু অমন সরল হাসিভরা মুখ, অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব—বলতে বড় বাধল। মনে মনে বললুম, তোমরা কেবল বুঝি স্নেহ ঢেলে দিতেই জানো ? তোমাদের স্নেহ-পাত্রদের বিদায়ের বাজনা যে বেজে উঠেছে এ সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞান কেন ?

জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, একটা কথা বলি, আপনি আমায় এই অল্পদিনে এত ভালবাসলেন কি করে ? আচ্ছা আপনারা কি ভালবাসার পাত্রাপাত্রও দেখেন না ? আমি কে বৌদি যে আমার জন্যে এত করেন ?

বৌদিদির মুখ গম্ভীর হয়ে এলো। তাঁর ওই এক বড় আশ্চর্য ছিল, মুখ গম্ভীর হলে প্রায়ই চোখে জল আসবে, জল কেটে গেল তো আবার হাসি ফুটবে। শরতের আকাশে রোদ-বৃষ্টি খেলার মত। বললেন--এতদিন তোমায় বলিনি বিমল, আজ পাঁচ বছর হ'ল আমারও ছোট ভাই আমার মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে, তারও নাম ছিল বিমল। থাকলে সে তোমারই মত হত এতদিন। আর তোমারই মত দেখতে। তুমি যেদিন প্রথম এ রাস্তা দিয়ে যাও, তোমায় দেখেই আমার মনের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠল, সেদিন বাড়ী গিয়ে আপন মনে কত কেঁদেছিলাম। তুমি এখান দিয়ে যেতে, রোজ তোমাকে দেখতাম। যেদিন তুমি আপনা হতেই দিদি বলে ডাকলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে কি সুখে আছি তা বলতে পারি নে। তোমায় যত্ন করে, তুমি যে বড় বোনের মত ভালবাসো, তাতে আমি বিমলের শোক অনেকটা ভুলেছি। ওই এক ভাই ছিল আমার। তুলসীতলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা কত প্রণাম করি, বলি, ঠাকুর এক বিমলকে তো পায়ে টেনে নিয়েছ, আর এক বিমলকে যদি দিলে তো এর মঙ্গল করো ; একে আমার কাছে রাখো।

চোখের জলে বৌদিদির গলা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি কিছু বললুম না। বলব কি ।

একটু পরে বৌদিদি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জলভরা চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন। কি সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল। কালো চোখ দুটি ছলছল করছে, টানা ভুরু যেন আরও নেমে এসেচে, চিবুকের ভাঁজটি আরও পরিস্ফুট, যেন কোন্ নিপুণ প্রতিমাকারক সরু বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে কেটে তৈরী করেছে ।...পথের পাশেই প্রথম ফাল্গুনের মুগ্ধ আকাশের তলায় আঁকোড় ফুলের একটা ঝোপে কাঁটাওয়ালা ডালগুলিতে থোলা থোলো সাদা ফুল ফুটে ছিল...মনের ফাঁকে ফাঁকে নেশা জমিয়ে আনে, এমনি তার মিষ্টি গন্ধ !

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলুম না। খানিক পরে বৌদিদি বললেন—সেই জন্যেই বলছি ভাই, মাকে আনো। আমাদের পাড়ায় চৌধুরীদের বাড়ীটা পড়ে আছে। ওরা এখানে থাকে না। খুব ভাল বাড়ী, কোন অসুবিধা হবে না, তুমি মাকে নিয়ে এসো, ওখানেই থাক, সে তাঁদের পত্র লিখলেই তাঁরা রাজী হবেন, বাড়ী তো এমনি প'ড়ে আছে। তোমার বোন পরাধীন, কিছু করবার তো ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে এসব দেখাশোনা, এসব লুকিয়ে, বাড়ীর কেউ জানে না। তুমি দু'বেলা ঘাটের পথ দিয়ে যেও, দেখেই আমি শান্তি পাব ভাই। মাকে এ মাসেই আনো।

কেমন করে তা হবে ?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আমি এখানে থাকলে কি আপনি খুব সুখী হন ?

বৌদিদি বললেন—কি বলব বিমল ? মাকে আনলে তোমার কষ্টটাও কম হয়, তা বুঝেও আমার সুখ ! আর বেশ দুটি ভাই-বোন এক জায়গায় থাকব, বারো মাস দু'বেলা দেখা হবে, কি বলো ?

আমি বললুম—ভাই যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে আপনার কাছে, তাকে ক্ষমা করতে পারবেন ?

বৌদিদি বললেন–শোন কথার ভঙ্গী ভাইটির আমার, আমার কাছে তোমার আবার অপরাধটা কিসের শুনি ?

আমি জোর করে বললুম—না বৌদি, ধরুন যদি করি তা হ'লে ?

বৌদিদি আবার হেসে বললেন—না না, তা হ'লেও না। ছোট ভাইটির কোন কিছুতেই অপরাধ নেই আমার কাছে, আমি যে বড় বোন।

চোখে জল এসে পড়ল। আড়ষ্ট গলায় বললুম—ঠিক বৌদি, ঠিক !

বৌদি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন—বিমল, কি হয়েছে ভাই! অমন করছ কেন ?

মুখ ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হলুম, বললুম—কিছু না বৌদি, অমনি বলছি।

বৌদিদি বললেন—তবুও ভাল। ভাইটির আমার এখনও ছেলেমানুষি যায়নি। হ্যাঁ, ভাল কথা বিমল, তুমি ভালবাস বলে বাগানের কলার কাঁদি আজ কাটিয়ে রেখেছি, পাকলে একদিন ভাল করে দেব এখন।

তার পরদিনই আমার নোটিশ অনুসারে স্কুলের কাজের শেষদিন। গিয়ে শুনলাম আমার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্কুলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

শুধু একবার শেষ দেখা করবার জন্যেই তার পরদিন পুকুরের ঘাটে ঠিক সময়ে গেলুম। তাঁর দেখা পেলে যে কি বলব তা ঠিক করে সেখানে যাইনি, সত্য কথা সব খুলে বলতে বোধ হয় পারতুম সেদিন—কিন্তু দেখা হল না! সব দিন তো দেখা হত না, প্রায়ই দু'তিন দিন অন্তর দেখা হত, আবার কিছুদিন ধরে হয়ত রোজই দেখা হত। সেদিন বিকালে গেলুম, তার পরদিন সকালেও গেলুম, কিন্তু দেখা পেলুম না।

সেদিন চলে আসবার সময় সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।....

সেইদিনই বিকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত সে গ্রাম পরিত্যাগ করলুম।

মাঠের কোলে ছাতিম গাছের বনের মধ্যে কোথায় ঘুঘু ডাকছিল।–

সে সব আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা।

তারপর জীবনে কত ঘটনা ঘটে গেল । ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু ! উপভোগ করে দেখলুম, এ কি মধু ! কত নতুন দেশ, নতুন মুখ, কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, নতুন নব-ঝোপের নতুন ফুল, কত জুঁই ফুলের মত শুভ্র নির্মল হৃদয়, কান্নাজড়ানো কত সে মধুর স্মৃতি !....

কাকার কাছে মোরাদাবাদে কাচের কারখানায় গেলুম। বছরখানেক পরে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে জার্মানীতে কাচের কাজ শিখতে। তারপর কোলোয়েঁ গেলুম, কাটা বেলোয়ারী কাচের কারখানার কাজ শেখবার জন্যে। কোলোয়েঁ অনেক দিন রইলুম। সেখানে থাকতে একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল, তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। "শিকাগো ইন্টার-ওশ্যন" কাগজের তিনি ফ্রান্স দেশস্থ সংবাদদাতা। কোলোয়েঁ সব সময় না থাকলেও তিনি প্রায়ই ওখানে আসতেন। তাঁরই পরামর্শে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গেলুম। তাঁর সাহায্যে দু'তিনটা বড় বড় কাচের কারখানার কাজ দেখবার সুযোগ পেলাম....পিট্‌সবার্গে কর্নেগীর ওখানে প্রায় ছ'মাস রইলুম, নতুন ধরণের ব্লাস্টফার্নেসের কাজ ভাল করে বোঝবার জন্য।....মিড্‌ল ওয়েস্টের একটা কাচের কারখানায় প্রভাত দে কি বসু ব'লে একজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরও বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলায়। সে ভদ্রলোক নিঃসম্বলে জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মহা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তাঁরই মুখে শুনলুম, সেয়াট্‌ল্‌-এ একটা নূতন কাচের কারখানা খোলা হচ্ছে। আমি জাপান দিয়ে আসব স্থির করেছিলুম, কাজেই আসবার সময় সেয়াট্‌ল্‌ গেলুম। তারপর জাপান ঘুরে দেশে এলুম।....মা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ভাই-দুটিকে নিয়ে গেলুম মোরাদাবাদে। বেশীদিন ওখানে থাকতে হ'ল না। বম্বেতে বিয়ে করেছি, আমার শ্বশুর এখানে ডাক্তারী করতেন। সেই থেকে বম্বে অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছি।

বহুদিন বাংলা দেশে যাইনি, প্রায় ষোলো-সতেরো বছর হল। বাংলা দেশের জল-মাটি গাছপালার জন্যে মনটা তৃষিত আছে। তাই আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বসে আমার সবুজ শাড়ী-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলুম।....রাজাবাই টাওয়ারের মাথার ওপর এখনও একটু একটু রোদ আছে। বন্দরের নীল জলে মেসাজেরী মারিতিম্‌দের একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এখানা এখুনি ছেড়ে যাবে। বাঁ-ধারে খুব দূরে এলিফ্যান্টার নীল সীমারেখা। ভাবতে ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃতপ্রায় ঝাপ্‌সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এলো। পঁচিশ বছর পূর্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠেছে আর্দ-বসনা তরুণী এক পল্লীবধূ !....মাটির পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা দুখানির রেখা আঁকা ।....আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণুকুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অনিশ্চয়তায় ভরা। আম কাঁঠালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু' একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্বলা বধূটির ওপর সস্নেহ

কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তারপর এক শান্ত আঙ্গিনায় তুলসী মঞ্চমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গল-প্রার্থিনী সে কোন্ প্রণাম-নিরতা মাতৃমূর্তি, করুণা মাখা অশ্রু ছলছল ।.....

ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো ? এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটে সেই রকম জল আনতে যাও ? আজ সে কত কালের কথা হল, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম, আবার কত কি পেলুম...আজ কতদিন পরে আবার তোমার কথা মনে পড়ল...তোমায় আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে দিদিমণি, তুমি আজও কি আছো? মনে আসছে, অনেক দূরের যেন কোন খড়ের ঘর....মিট্‌মিটে মাটির প্রদীপের আলো.....মৌন সন্ধ্যা....নীরব ব্যথার অশ্রু....শান্ত সৌন্দর্য-স্নেহ-মাখা রাঙা শাড়ীর আঁচল।...

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনও হয়নি।